বিপ্লবী-বালক: ক্ষুদিরাম বসু

সরোজ দাস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে কয়েকজন বিপ্লবীর নাম উচ্চারিত হলে আজও রক্তে শিহরণ জাগে, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য একটি নাম—ক্ষুদিরাম বসু। মাত্র আঠারো বছর বয়সে যিনি ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁর সেই আত্মত্যাগ আজও লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে রাখে। 'যুবশক্তি' পত্রিকার পাতায় আজ আমরা ফিরে দেখব সেই কিশোর বিপ্লবীর জীবন ও আত্মদানের কাহিনি, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়—বয়স কখনও সাহসের মাপকাঠি হতে পারে না।

ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম ১৮৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর, তৎকালীন বাংলার মেদিনীপুর জেলার হাবিবপুর গ্রামে (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়)। তাঁর পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু ছিলেন স্থানীয় জমিদারের অধীনে একজন কর্মচারী, আর মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ছিলেন একজন সাধারণ গৃহবধূ। শৈশবেই তাঁর জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়—মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি পিতা-মাতা উভয়কেই হারান। এরপর তাঁর বড় দিদি অপরূপা দেবীর কাছেই তাঁর লালনপালন হয়। শোনা যায়, শিশু ক্ষুদিরামের নাম রাখা হয়েছিল এক লৌকিক বিশ্বাসের বশে। তাঁর আগে জন্ম নেওয়া দুই ভাই-বোন শৈশবেই মারা গিয়েছিল বলে, তাঁর দীর্ঘায়ু কামনায় প্রতীকী এক আচার পালন করে তাঁকে সামান্য পরিমাণ 'খুদ' (ভাঙা চাল) দান করে তাঁর নাম রাখা হয় 'ক্ষুদিরাম'। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমান, নির্ভীক ও প্রতিবাদী মনোভাবাপন্ন। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তাঁর মধ্যে স্বদেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে।

বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ

উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নিষ্পেষণে জর্জরিত ছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত সমগ্র বাংলায় এক তীব্র প্রতিবাদের ঝড় তোলে। এই আন্দোলনের ঢেউ কিশোর ক্ষুদিরামের মনেও গভীর প্রভাব ফেলে। মাত্র পনেরো-ষোলো বছর বয়সেই তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন।

সে সময় বাংলায় সক্রিয় ছিল একাধিক গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন—অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল তাদের মধ্যে অন্যতম। ক্ষুদিরাম যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ব্যারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। তিনি ব্রিটিশবিরোধী প্রচারপত্র বিলি করা, গোপন বৈঠকে যোগদান, এমনকি অস্ত্র সংগ্রহের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে শুরু করেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি একবার গ্রেপ্তারও হন, কিন্তু বয়স কম হওয়ায় সেবার তিনি ছাড়া পান। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে দমিয়ে না রেখে বরং আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে।

কিংসফোর্ড হত্যা পরিকল্পনা

১৯০৮ সালে যুগান্তর দলের নেতৃত্ব একটি সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়—কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্ডকে হত্যা করার পরিকল্পনা। কিংসফোর্ড তাঁর কঠোর ও নিষ্ঠুর রায়ের জন্য কুখ্যাত ছিলেন, বিশেষত রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত নির্মম। কিশোর বিপ্লবীদের প্রতি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেওয়ার মতো ঘটনার কারণে তিনি বিপ্লবীদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। তাঁকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার তাঁকে কলকাতা থেকে বদলি করে বিহারের মুজফফরপুরে পাঠায়, কিন্তু বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত নেন—তাঁকে সেখানেই খুঁজে বের করে চরম শাস্তি দেওয়া হবে।

এই দুঃসাহসিক অভিযানের দায়িত্ব বর্তায় দুই তরুণ বিপ্লবীর কাঁধে—ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। উভয়েই তখন নিতান্তই তরুণ, কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তাঁরা মুজফফরপুরে গিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে কিংসফোর্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করেন এবং তাঁর গাড়ি শনাক্ত করার চেষ্টা করেন।

১৯০৮ সালের সেই রাত

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল রাতের ঘটনা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুজফফরপুরের ইউরোপিয়ান ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসা একটি গাড়িকে কিংসফোর্ডের গাড়ি ভেবে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী তাতে বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না; পরিবর্তে তাতে ছিলেন দুই ব্রিটিশ মহিলা—ব্যারিস্টার প্রিংগল কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা—যাঁরা এই বিস্ফোরণে প্রাণ হারান। এই ভুল লক্ষ্যবস্তুর ঘটনাটি ছিল নিছক দুর্ভাগ্যজনক কাকতালীয়, কারণ দুটি গাড়ির আকৃতি প্রায় একইরকম ছিল। ঘটনার পরপরই দুই বিপ্লবী পৃথক পৃথক পথে পালিয়ে যান। প্রফুল্ল চাকী মোকামাঘাট স্টেশনের কাছে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার মুখে তিনি পুলিশের হাতে নিজেই নিজেকে গুলি করে আত্মাহুতি দেন, যাতে তিনি জীবিত অবস্থায় ব্রিটিশদের হাতে ধরা না পড়েন এবং কোনো তথ্য ফাঁস না হয়। অন্যদিকে ক্ষুদিরাম দীর্ঘ পথ হেঁটে ওয়াইনি রেলস্টেশনের কাছে পৌঁছান, কিন্তু ক্লান্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় তিনি একটি চায়ের দোকানে জল চাইতে গিয়ে, দুই কনস্টেবল শিবপ্রসাদ সিং ও ফতেহ সিং-এর সন্দেহ হলে তাঁকে আটক করা হয়। তাঁর কাছে থাকা পিস্তল ও অন্যান্য সরঞ্জাম দেখে স্থানীয় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

ফাঁসির রায় ও সামাজিক অভিঘাত

গ্রেপ্তারের পর ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মুজফফরপুর আদালতে বিচার শুরু হয়। বিচার চলাকালীন তাঁর আচরণে বিন্দুমাত্র ভয়ের চিহ্ন দেখা যায়নি। তিনি নির্ভীকভাবে নিজের কার্যকলাপের দায় স্বীকার করেন এবং বলেন যে তিনি দেশের জন্য যা করেছেন, তার জন্য তিনি গর্বিত। আদালতে তাঁর শান্ত, দৃঢ় ও নির্ভীক আচরণ উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছিল। এমনকি বিচারকও তাঁর সাহসিকতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট, মাত্র আঠারো বছর ন'মাস বয়সে ক্ষুদিরাম বসুকে মুজফফরপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি দেওয়া হয়। ইতিহাস সাক্ষী, ফাঁসির মঞ্চে ওঠার সময়ও তাঁর মুখে কোনো ভীতির চিহ্ন ছিল

না—বরং তিনি ছিলেন প্রশান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জল্লাদ যখন তাঁর গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে যান, তখনও তিনি অবিচল ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর বয়স ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে ফাঁসিতে শহীদ হওয়া সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবীদের একজন হিসেবে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার মতো।

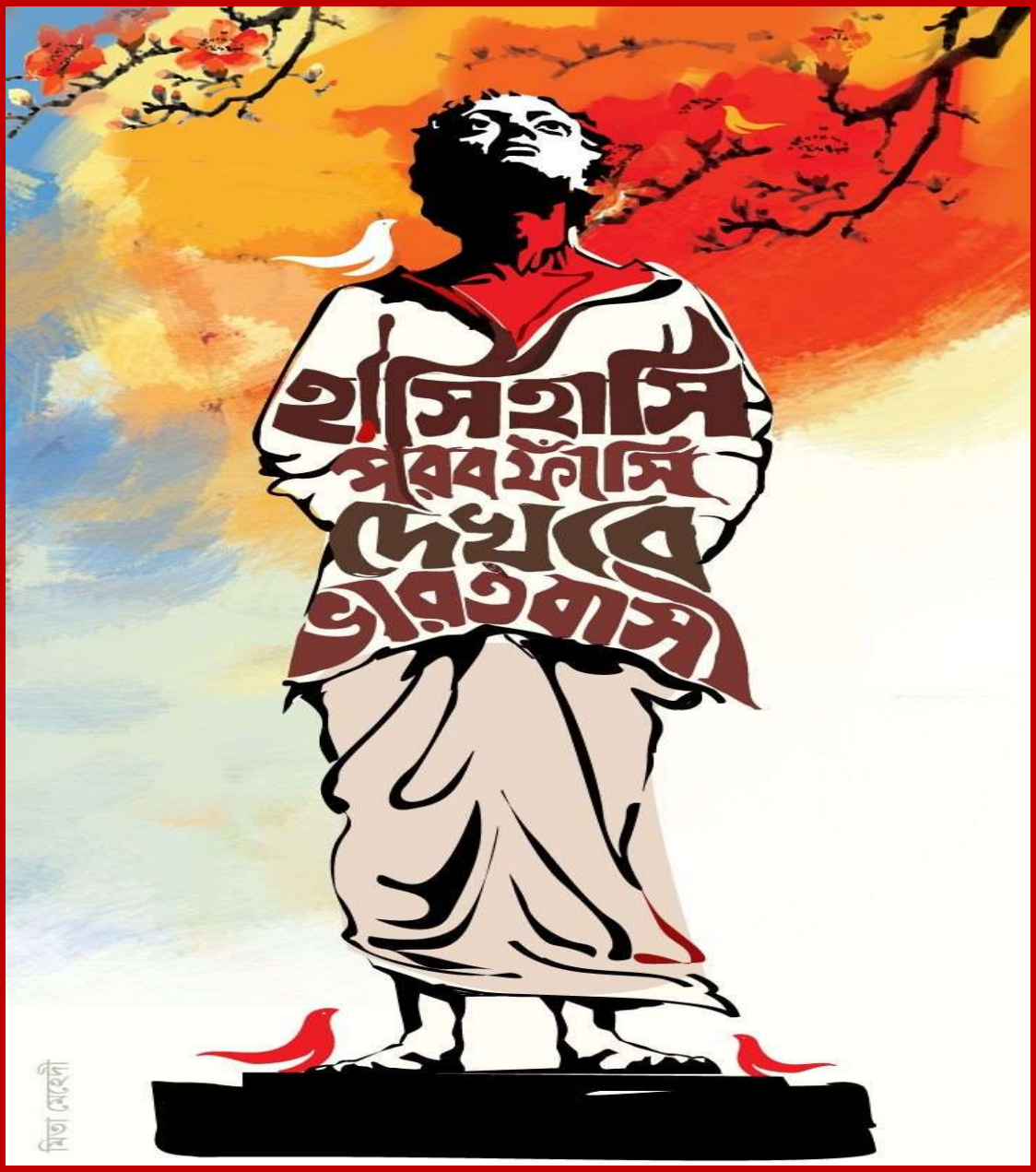

ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির পর সমগ্র বাংলা শোক, ক্ষোভ ও গর্বের এক অভূতপূর্ব আবেগে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। মাত্র আঠারো বছরের এক কিশোর যে হাসিমুখে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে—এই ঘটনা সাধারণ মানুষের কল্পনাকেও অতিক্রম করেছিল। সেই আবেগেরই প্রকাশ ঘটেছিল লোকগীতি, কবিতা ও দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে—

> "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি,
> হাসি হাসি পরব ফাঁসি,
> দেখবে ভারতবাসী।"

এই গানটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার গ্রাম থেকে শহর, ছাত্রসমাজ থেকে সাধারণ মানুষের কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সভা, মিছিল এবং বিপ্লবী সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানটি গাওয়া হতো। ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগকে কেন্দ্র করে রচিত এই গান বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে।

যুবশক্তির কাছে ক্ষুদিরামের বার্তা

আজকের প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের কাছে ক্ষুদিরাম বসুর জীবন এক অমূল্য শিক্ষা। আমরা যারা 'যুবশক্তি'র পাঠক-পাঠিকা, আমাদের কাছে তাঁর জীবনকাহিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে আনে।

> *প্রথমত, বয়স কখনও সাহসিকতার মাপকাঠি নয়। ক্ষুদিরাম যখন দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল আজকের অনেক কলেজ পড়ুয়া তরুণের চেয়েও কম। তবু তাঁর মনোবল ও দৃঢ়তা ছিল অতুলনীয়।*
>
> *দ্বিতীয়ত, আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার শিক্ষা তাঁর জীবন থেকে পাওয়া যায়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি নিজের বিশ্বাস থেকে এক চুলও বিচ্যুত হননি।*
>
> *তৃতীয়ত, তাঁর জীবন আমাদের শেখায় যে, ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আত্মনিয়োগ করাই প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয়। আজকের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু দেশ গঠনে, সমাজসেবায়, শিক্ষা ও উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর আদর্শকে নতুনভাবে বাস্তবায়িত করতে পারি।*

ক্ষুদিরাম বসুর জীবন ছিল স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগের তেজ আজও আমাদের জাতীয় চেতনায় প্রজ্বলিত রয়েছে। একজন কিশোরের মধ্যে যে অসীম সাহস, দৃঢ় সংকল্প ও দেশপ্রেমের আগুন জ্বলেছিল, তা আজও ভারতবর্ষের প্রতিটি তরুণ-তরুণীর কাছে এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা। 'যুবশক্তি'র প্রতিটি পাঠক-পাঠিকার কাছে আমাদের আহ্বান—আসুন, আমরা ক্ষুদিরামের সেই অদম্য সাহস ও আত্মত্যাগের চেতনাকে স্মরণ করি এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করি। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়তো আজ আর নেই, কিন্তু দেশের জন্য বাঁচার, দেশ গড়ার সেই একই দায়বদ্ধতা আজও আমাদের প্রতিটি প্রজন্মের কাছে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ক্ষুদিরাম বসু চিরকাল বেঁচে থাকবেন আমাদের হৃদয়ে, আমাদের ইতিহাসের পাতায়, আর প্রতিটি তরুণ প্রাণের বিদ্রোহী চেতনায়—এক অগ্নিশিখা হয়ে, যা কখনও নেভে না।

তথ্যসূত্র: এই নিবন্ধটি ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। নির্দিষ্ট তারিখ, ঘটনা ও উদ্ধৃতি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও নথিপত্র অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।